BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-II, December 2022
Pp. 07-18

বঙ্গবন্ধু-হত্যাকাণ্ড ও বাংলাদেশের রাজনীতির আদর্শিক পরিবর্তন : একটি পর্যালোচনা

অমল কুমার গাইন

সারসংক্ষেপ

একটি জাতিরাষ্ট্র হিসেবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই অঞ্চলে বাংলাদেশের অভ্যুদয় যে মূর্ত হয়ে উঠেছে তার কৃতিত্ব অবশ্যই শেখ মুজিবুর রহমানের। '৫২ এর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম, '৬৬ এর ৬-দফা, '৬৮ এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০ এর নির্বাচনে তা শক্তিশালী রূপ পেয়ে '৭১ এর মহান মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা চূড়ান্ত সফলতা পায়। এই দীর্ঘ পথযাত্রায় বাঙালির স্বপ্নের সারথি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ছিলেন হাজার বছর ধরে এ জনপদের ভাগ্যবঞ্চিত মানুষের একমাত্র প্রতিনিধি। জাতিরাষ্ট্র গঠনের পর খেতাব পেয়েছিলেন জাতির পিতা। কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস, সেই জাতির পিতাকে '৭৫ এর ১৫ আগস্ট নির্মমভাবে নিহত হতে হয়, কতিপয় বাঙালি সেনাসদস্যের হাতে। প্রকৃত বিচারে এই হত্যাকাণ্ডটি যতটা ছিল রাজনৈতিক তার চেয়ে বেশি ছিল আদর্শিক। খুনিরা একটি বড় পাকিস্তান ভেঙ্গে ছোট পাকিস্তান চেয়েছিল, তারা মুজিবের রাষ্ট্রীয় আদর্শকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। সপরিবারে জতির জনকের হত্যাকাণ্ডটি ছিল সমুদ্রে ভাসমান হিমশৈলের মতো, যার কিছু অংশ দৃশ্যমান হলেও অদেখা থেকে যায় বিশাল অংশ। আপাতদৃষ্টিতে দেশে এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেয় খোন্দকার মোস্তাক গং, সেনাসদস্যরা ছিল ঘাতকের ভূমিকায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত ছাড়া যে এতবড় হত্যাকাণ্ড সম্ভব নয়, সেটি এখন অনেকটা পরিষ্কার। ১৫ আগস্টের এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর দেশ আবার পিছন দিকে চলতে শুরু করে, ঘটতে থাকে আদর্শিক বিপর্যয়। যে চেতনা নিয়ে বাঙালি মুক্তিযুদ্ধ করে, যে মূলনীতির উপর ভর করে রাষ্ট্রের পথচলা শুরু হয় '৭৫ এর ১৫ আগস্টের পরে তা স্রেফ উধাও হয়ে যায়। কথিত গণতন্ত্রের নামে শুরু হয় স্বৈরতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র, হত্যা-গুমের রাজনীতি, রাজনীতিতে সহনশীলতার পরিবর্তে হানাহানি। ভাগ্যবঞ্চিত বাঙালির স্বপ্ন ছিনতাই হলো। '৪৭ এর মতো আরো একবার প্রতারিত হলো এ জনপদের মানুষ।

অমল কুমার গাইন
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
সরকারি ব্রজলাল কলেজ
খুলনা, বাংলাদেশ
e-mail: amalgain75@gmail.com

মূলশব্দ

বঙ্গবন্ধু, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র, হত্যাকাণ্ড, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ-চেতনা, ইনডেমনিটি, ষোড়শ ডিভিশন, ফেনোমেনন, সংবিধান, রাজনীতিতে সহনশীলতা

গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণা প্রবন্ধটি বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে। ব্যবহার করা হয়েছে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বই পুস্তক, জার্নাল, পত্র-পত্রিকা এবং প্রামাণিক গ্রন্থ।

বিশ্লেষণ

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, যিনি গোটা জাতিকে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে চেতনার সেই শীর্ষবিন্দুতে নিয়ে যান, যেখানে দাঁড়িয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা ভিন্ন বিকল্প কিছু চিন্তাও করেনি, যে চেতনা নিরস্ত্র বাঙালিকে সশস্ত্র যুদ্ধে প্রাণিত করে সীমাহীন মূল্যে বিজয়ের গৌরবে ভাস্বর করে তুলেছিল; তারই মহানায়ক জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান বিজয়ের মাত্র ৩ বছর ৭ মাস ৩ দিনের মাথায় কতিপয় উচ্চাভিলাষী সেনাকর্মকর্তার হাতে সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন। আপাতদৃষ্টিতে ১৫ আগস্টের ট্রাজেডি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় হলেও এর সাথে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ক্রিয়াশীল ছিল বলে জানা যায়। বাঙালি জাতি যে চেতনায় ১৯৭১ এ মুক্তিযুদ্ধ করেছিল, ১৫ আগস্টের পৈশাচিক ঘটনার পর জাতি যেন কক্ষচ্যুত হয়ে পড়লো, বিপরীত স্রোতে চলতে শুরু করলো; চললো স্বার্থোদ্ধার আর ক্ষমতালিপ্সার নানা ষড়যন্ত্র। চললো আদর্শচ্যুতি আর ইতিহাস বিকৃতির ঘৃণিত কৌশল।

হত্যাকাণ্ড

সাধারণ জনগণের ভেতর দিয়ে শেখ মুজিবের বঙ্গবন্ধু এবং জাতির জনক হয়ে ওঠা। সেই জনগণের মাঝে সুউচ্চ প্রাচীর তুলে গণভবনে বিচ্ছিন্নভাবে জীবন যাপন তিনি পছন্দ করতেন না। জীবনের ঝুঁকি বহুবার এসেছে এবং ১৯৭২ সাল থেকে প্রায়শ তিনি বলতেন একটা গুলি তাঁকে সর্বদাই তাড়া করে ফিরছে। অনেকের কাছ থেকে সাবধান বাণীও পেয়েছিলেন, তারপরেও নিরাপত্তার ব্যাপারে খুব চিন্তিত ছিলেন বলা যাবে না। স্বাধীনতার পরে সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'আমি মরতে শিখেছি, 'কাজেই মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে লাভ নেই'।[১] কিন্তু ১৫ আগস্টের সেই বিভীষিকাময় সকালে তাঁর আর্তি এবং তৎপরতায় বোঝা যায় তিনি তাঁর দুখি বাঙালির জন্য হলেও কিছুদিন বাঁচতে চেয়েছিলেন। এ কারণে সাহায্যের আশায় তিনি অনেককে টেলিফোন করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এবং অবশ্যই লজ্জার, জাতির জনকের জীবন বাঁচাতে উল্লেখযোগ্য কেউ সেদিন এগিয়ে আসেনি। এটি ইতিহাসের নির্মম ট্রাজেডি। খুনিরা তাঁর বাড়িতে প্রায় আধা ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করেছিল, তড়িৎ কোনো ব্যবস্থা কোনো সেক্টর থেকে নেয়া হলে হয়তো ক্ষতি কিছুটা রোধ করা যেতো।

১৪ আগস্ট ১৯৭৫। এ দিনের সন্ধ্যাটি অন্যান্য দিনের থেকে আলাদা মনে হয়নি। যারা ১৫ আগস্টের ঘটনা এবং এর নেপথ্যে জড়িত ছিলো শুধু তাদের কাছে ভিন্ন ছিল।

পরদিন শেখ মুজিবুর রহমানকে সংবর্ধনা দেয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তুতি চলছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বরাবরই একটা দুঃখবোধ ছিল। ১৯৪৯ সালের ৩ মার্চ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নবেতনভোগী কর্মচারিদের ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২৭ জন ছাত্রকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করে। ক্ষমা ও জরিমানা দিয়ে একটা সময় সবাই ক্লাসে ফিরে গেলেও আত্মমর্যাদার প্রশ্নে অটল শেখ মুজিব সেটা করেননি। যে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর ছাত্রত্ব কেড়ে নিয়েছিল সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যাবেন চ্যান্সেলর হিসেবে। দশ বছর বয়সি পুত্র শেখ রাসেলও খুবই উত্তেজিত। কেননা ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটারি স্কুল কর্তৃপক্ষ শেখ মুজিবকে স্বাগত জানাতে যে ৬ জন ছাত্রকে বাছাই করেছিল তার মধ্যে রাসেল একজন।

প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে রুটিন করে ঢাকা শহরে ট্যাঙ্ক মহড়া হতো এবং মাসে দুবার বেঙ্গল ল্যান্সার ও সেকেন্ড আর্টিলারির যৌথ মহড়া হতো। মহড়া শেষে ট্যাঙ্কগুলো রাত ১২টা ৫৫ মিনিটের মধ্যে ব্যারাকে ফিরে যেত কিন্তু সেদিনে ট্যাঙ্কগুলো ফিরে যাইনি। ট্যাংকবাহিনীর প্রধানের অবর্তমানে সেদিন এ দায়িত্ব এসে পড়ে খুনি ফারুকের হাতে। এ দিন দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটি শক্তিশালী গ্রেনেড বিস্ফোরিত হওয়ায় সেনাদের তৎপরতাও বেড়ে যায়। পরদিন বঙ্গবন্ধুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন এবং গ্রেনেড বিস্ফোরণের কারণে সারারাত সেনা তৎপরতাকে ঢাকাবাসি অনেকটা স্বাভাবিক ঘটনা বলে মেনে নিয়েছিলো।

১৫ আগস্ট ভোর বেলা আব্দুর রব সেরনিয়াবতের বাড়িতে আক্রমণের খবর শুনে বঙ্গবন্ধু দোতলা থেকে ব্যক্তিগত সহকারি মোহিতুল ইসলামকে পুলিশকে ফোন করতে বলেন। কিছুক্ষণ পরে বঙ্গবন্ধু নিচে নেমে আসলে মোহিতুল তাঁকে জানান পুলিশ ফোন ধরছে না। তখন বঙ্গবন্ধু নিজেই চেষ্টা করেন। সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক গুলি বাড়ির নিচতলার অফিসকক্ষের দেয়ালে লাগে। বঙ্গবন্ধু টেবিলের আড়ালে বসে পড়েন। কিছুক্ষণ পর গুলি থেমে গেলে তিনি সেন্ট্রিদের গুলি ছোঁড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করতে করতে উপরে উঠে যান। নিচে নেমে আসেন শেখ কামাল। কালো ও খাকি পোশাক পরিহিত ঘাতকের দল শেখ কামালকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন শেখ কামাল। মেজর মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে একটি দল গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে দোতলায় ওঠে বঙ্গবন্ধুর খোঁজে। শেখ মুজিব ঘর থেকে বের হয়ে বলেন "কি চাস তোরা?" '৭১ এর ২৬ মার্চ রাতে এই বাড়িতে তিনি পাকিস্তানি সেনাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন, আজ তাঁর সামনে নিজের দেশের সেনারা, যাদেরকে তিনিই একটি স্বাধীন জীবন, সুন্দর ভবিষ্যৎ দিয়েছেন। দোতলা থেকে নামার সময় সিঁড়িতে মুজিবের সাথে মেজর হুদার দেখা হয়। বঙ্গবন্ধু বলেন 'তাহলে তুমিই এ সব করছো। কি চাও তুমি?'

' আপনাকে নিতে এসেছি।'

'কোথায়?'

'ক্যান্টনমেন্টে'।

মুজিব বাজখাঁই কণ্ঠে বলেন 'তুমি কি আমার সাথে রসিকতা করছো? আমি কখনও এ দেশকে ধ্বংস হতে দেবো না। হুদা বিব্রত। বঙ্গবন্ধুর চোখে চোখ রেখে কথা বলার মতো সাহস হুদা কেন, কোনো বাঙালির ছিল না। ঠিক আছে, আমি কামালকে সাথে নিয়ে যাবো বলে ডাকতে থাকেন। এমন সময় ভৃত্য ফরিদ চিৎকার করে বলে ওঠে 'কামাল ভাইকে ওরা মেরে ফেলেছে'। বঙ্গবন্ধুর অন্য মূর্তি, তোরা কামালকে মেরেছিস কেন? যা তোদের সাথে আমি যাবো না, বলে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে থাকেন। মেজর ফারুক একটা হাত ধরলে তিনি ঝাড়া দিয়ে ফেলে দেন। সাথে সাথে পিছন থেকে হাবিলদার মোসলেহ উদ্দীন স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে মুজিবের উপর গুলি চালান। ফিদেল কাস্ত্রোর চোখে হিমালয়তুল্য বঙ্গবন্ধুকে সামনাসামনি গুলি করার ক্ষমতা কারো ছিল না। সিঁড়িতে লুটিয়ে পড়লেন বঙ্গবন্ধু, লুটিয়ে পড়লো বাংলাদেশ।[২] নিজের রক্তধারায় স্নান করিয়ে দিয়ে গেলেন সবুজ-শ্যামল বাংলাদেশকে।

গুলির শব্দ শুনে বেগম মুজিব ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলেন "তোমরা তাঁকে হত্যা করেছো, আমাকেও হত্যা করো"। ঘাতকরা চিরতরে নিস্তব্ধ করে দিল তাঁকে । শেখ জামাল, স্ত্রী রোজী এবং কামালের স্ত্রী সুলতানা তখনও ড্রেসিং রুমের ভেতরে ছিলেন। স্টেনগানের গুলিতে তারা তিনজনই নিহত হলেন।

বন্দুকধারীরা বাথরুমে শেখ নাসেরকে খুঁজে পায় এবং তাকে হত্যা করে। রাসেল এক কোনায় ভয়ে কুঁকড়ে ছিলো। কেঁদে উঠে বলে-আমাকে আমার মায়ের কাছে নিয়ে যাও। নৃশংস খুনিদের একজন বললো "আমরা তোমাকে তোমার মায়ের কাছেই পাঠাবো"। গুলিতে একটি হাত উড়ে যাওয়ার পরেও রাসেল অনুনয় করেছিল "আমাকে মেরো না, আমাকে মেরো না"। উত্তর এসেছিল খুনির নির্মম বুলেট।

তারপর আর কোনো প্রার্থনা, আর কোনো আকুতি আর কোনো কান্না ছিল না। ছিল না মায়ের কাছে যাওয়ার করুণ আকুতি। সবকিছু নিস্তব্ধ।

সেদিন একই রকম নির্মমতা হয়েছিল শেখ মুজিবের ভাগ্নে ধানমণ্ডি ১৩নং রোডে শেখ ফজলুল হক মনি এবং ২৭নং মিন্টো রোডে ভগ্নিপতি আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায়। শেখ মনির অন্তসত্ত্বা স্ত্রীও সেদিন হায়েনাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি।

প্রায় তিন যুগের বেশি সময় ধরে শত নির্যাতন ও উৎপীড়নের মধ্য দিয়ে যে মহান নেতার সৃষ্টি, বছরের পর বছর ধরে নির্জন কারাগারে দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করে যে রাজনৈতিক মহাপুরুষের অভ্যুদয়, শত প্রলোভন ও ভয়-ভীতির মুখে যে বিশাল ব্যক্তিত্ব এবং সৌম চেহারার পুরুষসিংহ বিরাট মহীরূহের মতো দাঁড়িয়েছিলেন; এক ভয়াবহ চক্রান্তের শিকার হয়ে বাঙালির নয়নের মণি সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৫ আগস্ট সুবেহ সাদেকের প্রাক্কালে এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন। অন্ধকারের পথে ধাবিত হলো বাংলাদেশ।

উচ্চাভিলাষী সামরিক অফিসারদের হাতে রাষ্ট্রনায়কদের জীবনহানি বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন ঘটনা নয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি, চিলির প্রেসিডেন্ট আলেন্দে, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ, ভারতের শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানসহ অনেকে এরকম হত্যাকাণ্ডের শিকার

হয়েছেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানের হত্যাকাণ্ড ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোনো রাষ্ট্রনায়ক এভাবে সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হয়নি। ৪০ থেকে ৪২ হাজার সেনাসদস্যের মধ্যে মাত্র ১৭০ জন সেনাসদস্য প্রত্যক্ষভাবে এই বর্বর কাজে লিপ্ত ছিল এবং এদের মধ্যে দৃশ্যপটে আসা সেনা কর্মকর্তাদের সর্বোচ্চ পদবী ছিল মেজর, কোনো উচ্চপদস্ত সেনাকর্মকর্তা এদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন বলে জানা যায় না। তারা সবাই ছিলো পাকিস্তানের তৈরি এবং তারা নিজেদের মহৎ মনে করার বিভ্রমে আক্রান্ত। ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড, এর ব্যাপ্তি দেখলে বোঝা যায় শুধু ক্ষমতার জন্য এমন নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড হয়নি, এ জঘন্যতার পিছনে ছিল একটি দেশের জন্মের বিরুদ্ধেই প্রতিশোধ, একটি আদর্শ, একটি চেতনাকে সমূলে বিনাশ করা। এদেশের জন্ম যারা মেনে নিতে পারেনি, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা যারা মেনে নিতে পারেনি তারাই এই বর্বতার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। দেশে এদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেন খোন্দকার মোশতাক গং, সাথে ছিলো বিদেশি প্রেরণা। দেশে তারা একটি আইন (ইনডেমনিটি আইন) তৈরি করেছিল এই খুনিদের বিচার করা যাবে না এবং সেটি আবার জাতীয় সংসদে পাস করিয়েও নিয়েছিল। দুনিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসে এমন বর্বরতা, অসভ্যতা দ্বিতীয় কোথাও সংঘটিত হয়েছে বলে জানা যায় না।

পরিকল্পনা

মূলত ১৯৭৪ সাল থেকে মুজিব হত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগ চলে। *যাকে হত্যা করতে চাও, তার নামে বদনাম দাও* খুনিরা এই প্রবাদটি মাথায় রেখে শেখ মুজিবকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করে।

১৯৭২-৭৩ সালে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ছিলো খুবই নাজুক। রাজনৈতিক মহলের মতে পাকিস্তানি 'কোলবরেটার' থেকে শুরু করে বিলুপ্ত মুসলিম লীগ, ক্ষমতাপ্রাপ্ত 'ব্যুরোক্রাট' থেকে বে-আইনে জামায়াতে ইসলামী, একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী থেকে একশ্রেণির সাংবাদিক কেউই মনের গহীনে স্বাধীন বাংলাদেশকে মেনে নিতে পারেনি।[৩] এ সময় এক ডজনের মতো চীনপন্থী কমিউনিস্ট উপদল 'বাংলাদেশ' শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করতো না। এদের অন্যতম কমরেড সিরাজ সিকদারের শ্লোগান ছিলো, 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হায়, লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়'। এ সময় চরম দক্ষিণ ও উগ্র বামপন্থীদের হাতে ৫ জন পার্লামেন্ট সদস্যসহ প্রায় ৬ হাজার আওয়ামী লীগ কর্মী নিহত হয়।[৪]

কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে '৭৪ সালে ১ টাকার লবণ কোথাও কোথাও বেড়ে ৬০ টাকায় গিয়ে দাঁড়ায়। অথচ তখনও চট্টগ্রামে প্রচুর লবণ মজুদ ছিল। আমলাদের এহেন অব্যবস্থপনায় জনগণের মনে ক্ষোভ ছিল কিন্তু বঙ্গবন্ধুর প্রতি অগাধ আস্থার কারণে জনবিক্ষোভ হয়নি।

'৭৪-এ বে-আইনি অস্ত্র এবং চোরাচালান রোধে সেনাবাহিনিকে মাঠে নামানো হলে তারা বেছে বেছে আওয়ামী লীগ কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রেফতার করে চরম নির্যাতন করতে থাকে। গ্রেফতারকৃতরা স্থানীয় মন্ত্রী সাংসদদের সাহায্য নিয়েও পরিত্রাণ পায়নি।

এ সময় ভারত থেকে ছাপানো দুটি দশ টাকার নোটে একই নম্বর দেখা গেলে কিছু সংবাদপত্র ছবিসহ সেটি প্রকাশ করে। ছড়িয়ে পড়ে, ডাবল নোট ছাপিয়ে ভারত বাংলাদেশের সব সম্পদ টেনে নিচ্ছে। সরকার সব নোট বাজার থেকে তুলে নিয়েও দেখা গেল, ছাপানো নোট থেকে জমাকৃত নোটের সংখ্যা কম।[৫] কিন্তু দুঃখের বিষয় বিরোধীরাতো বটেই আওয়ামী লীগের এক শ্রেণির সদস্য এই অপপ্রচারে যুক্ত ছিল। এ সময় শেখ মুজিব জনৈক সাংবাদিককে বলেছিলেন, "একটা গুলি তাকে 'চেজ' করে ফিরছে। একবার তাঁকে রেঞ্জের ভেতরে পাইলেই শেষ"।[৬] ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়, '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে বিধ্বস্ত অর্থনীতি, জনপদ, '৭২-'৭৩-এ উপর্যুপরি খরা এবং বন্যায় ফসল হানি, '৭৪-এ বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব, সাথে মানবসৃষ্ট দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪-এ জন সোয়েইন সানডে টাইম পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশ কি ভুল সময়ে জন্ম নিয়েছিলো? বঙ্গবন্ধুকে অনেকটা একাই এ সব দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হচ্ছিল। এতদসত্ত্বেও জনপ্রিয়তায় যে ভাটা পড়েনি সেটা ৭৩ নির্বাচনের ফলাফলের দিকে তাকালে বোঝা যায়। ৭২ শতাংশ ভোট পেয়ে ২৯১টি আসন লাভের একক কৃতিত্ব শেখ মুজিবের।

পূর্বেই বলা হয়েছে ৭৪ সাল থেকে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রেক্ষাপট তৈরি হচ্ছিল। বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রণে জুন মাসে ভুট্টো যখন ঢাকা আসেন তখন বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানানো লোকের ভিড় সামলাতে পুলিশকে রীতিমত হিমশিম খেতে হয়েছিল, কয়েক রাউণ্ড গুলিও ব্যয় করতে হয়। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যার নির্দেশদাতার আগমনে মানুষের এই আগ্রহ, এটি নিঃসন্দেহে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সফরে বাংলাদেশের দেনা-পাওনার ব্যাপারে কোনো ইতিবাচক সিদ্ধান্ত না হওয়ায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব যখন বলেন, ভুট্টোর সাথে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। তখন ভুট্টো বলেন বাংলাদেশে তাঁর সফর সফল। এই সফলতা আসলেই কী, সেটা সহজেই অনুমেয়। এর আগে ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল কাবুলে পাকিস্তানি মিলিটারি একাডেমিতে এক ভাষণে তিনি বলেন, 'শিগগিরই এ অঞ্চলে কিছু বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে'।[৭]

হত্যাকাণ্ডের চূড়ান্ত পর্যায়

'৭৫ সালটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। '৭১-এ জাতীয় মুক্তির ডাকে সকল বাঙালি মিলে যেমন বিজয় নিশ্চিত করেছিল ঠিক তেমনি '৭৫ এ বাকশাল গঠন করে জাতির জনক সবাইকে নিয়ে দেশটাকে গড়ার নতুন উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তারই অংশ হিসেবে সমগ্র দেশকে ৬০টি জেলায় বিভক্ত করে ১লা সেপ্টম্বর থেকে একজন গভর্ণরের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। ১৫ আগস্ট ছিল গভর্ণরদের ট্রেনিং এর শেষ দিন। '৭৫-এর জুন মাসের মধ্যে সোয়া চার কোটি গজ কাপড় উৎপাদন, দেড় লাখ টন সার উৎপাদন, খাদ্য শস্য উৎপাদন আড়াই লাখ টনে বৃদ্ধি পেয়েছিল। দেশ স্বনির্ভরতার দিকে যাচ্ছে, এটা বুঝতে পেরে শত্রুরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলো।[৮]

প্রতিরোধ-প্রতিক্রিয়া

মুজিব হত্যার সাথে সাথে সংসদ সদস্যগণ রাজনৈতিকভাবে নিহত হয়ে সেনা নির্ভর হয়ে পড়েন। শেখ মুজিবকে যারা নেতা অপেক্ষা পিতা বলতে বেশি পছন্দ করতেন তারাই তাঁর লাশ ৬৭৭ নং বাড়ির সিঁড়িতে

থাকা অবস্থায় খন্দকার মোশতাকের মন্ত্রীসভায় শপথ নেন। ১৫ আগস্ট ১০ জন পূর্ণমন্ত্রী ও ৬ জন প্রতিমন্ত্রী এবং ২০ আগস্ট আরো ৫ জন প্রতিমন্ত্রী নিয়ে মোশতাক মন্ত্রীসভা গঠন করেন।[৯] এরপরে চতুর মোশতাক ১৬ অক্টোবর বঙ্গভবনে অধিবেশন আহবান করেন। প্রতিবাদ হবে জেনেও তিনি এ কাজটি করেন। মোশতাক বিশ্বকে দেখাতে চেয়েছিলেন শেখ মুজিব বাদে সবকিছুই ঠিক আছে। সেখানে কুমিল্লার সিরাজুল হক সরাসরি মোশতাকের কাছে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করলে মোশতাক কোনোরকম তর্কে না গিয়ে অধিবেশন শেষ করেন।

দল হিসেবে আওয়ামী লীগ

দল হিসেবে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করতে ব্যর্থ হয়। ফণীভূষণ মজুমদারের মতো সাহসী, আপোষহীন ব্যক্তি যখন মন্ত্রীসভায়, মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এম এ জি ওসমানি যখন মোশতাকের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা, সংসদ সদস্যরা সবাই যখন আওয়ামী লীগের, তখন কে মোশতাকের লোক, আর কে না বোঝার উপায় ছিল না। এরকম পরিস্থিতিতে যে কোনো ধরনের প্রতিবাদে ঝুঁকি ছিলো। তাছাড়া ক্ষমতা হাতে নিয়েই খন্দকার মোশতাক আওয়ামী লীগ কর্মীদের ধন-প্রাণ রক্ষার সব রকমের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য থানায় থানায় নির্দেশ পাঠান।[১০] নতুন মন্ত্রীসভার চেহারা এবং মোশতাকের নির্দেশ আওয়ামী লীগ কর্মীদের বিভ্রান্ত করে।

সেনাবাহিনী

সেনাসদস্যরা আদর্শগতভাবে বিভাজিত ছিলো। যুদ্ধের শেষদিকে পাকিস্তান ফেরত সেনাসদস্যরা চেতনাগত দিক থেকে সম্পূর্ণ মুজিব বিরোধী ছিল। তারা একটি বড় পাকিস্তান ভেঙ্গে ছোট পাকিস্তান চেয়েছিল। এরা কোনোভাবেই বঙ্গবন্ধুর চেতনার সাথে একাত্ম হতে পারেনি। পাকিস্তানি সেনাদের মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ এসব সেনারা মনে করতো তাদের জন্মই হয়েছে শাসন করার জন্য। এ জঘন্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিয়ে সেনাবাহিনিতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চাইলে উর্ধ্বতন সেনাকর্তাদের কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। ১৬ আগস্ট সকালে সেনাপ্রধান জেনারেল সফিউল্লার সভাপতিত্বে চলমান সভায় ব্রিগেডিয়ার শাফায়েত জামিল (ঢাকা গ্যারিসনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) এবং খালেদ মোশাররফ যখন শাস্তির প্রস্তাব উঠালেন তখন কিছু কর্মকর্তা পরিস্থিতি আরও পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরামর্শ দেন। ১৫ আগস্ট সকালেও একইভাবে শাফায়েত জামিলকে থামানো হয়। এটিই চেয়েছিল ষড়যন্ত্রকারীরা।[১১] তখনও সেনাবাহিনিতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারলে ৩ নভেম্বরের ট্রাজেডি, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমাণ্ডার খালেদ মোশাররফসহ অন্যান্য নির্মম হত্যাকাণ্ডগুলো হয়তো ঠেকানো যেতো।

মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মাওলানা ভাসানী, মণি সিং, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদসহ বিরোধীদলের নেতাদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। যুদ্ধের পরে এ কমিটি বাতিল হয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা যে যার মতো করে আওয়ামী লীগের সাথে সম্পর্ক রেখে সরকারি সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে থাকে। এ কাজে যারা

অপারগ ছিলেন তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে সরকার বিরোধী প্রকাশ্য ও গোপনদলে যোগ দেন। অনেকের কাছে অস্ত্র থাকায় হত্যা, ছিনতাই, রাহাজানিসহ নানা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে সব তরুণ একই তাঁবুর নিচে থেকে, একই পাতে আহার করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছেন, কয়েক মাসের মধ্যে তারা একে অপরের চরম শত্রুতে পরিণত হলো। এভাবেই মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের এই দুর্দশায় পরাজিত শক্তি উল্লসিত হলো এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের ঢালাওভাবে বিভিন্ন অপকর্মের নায়ক বলে অভিহিত করতে শুরু করে। এ সব অপরাধে যাদের গ্রেফতার করা হয়, দেখা গেল তারা প্রায় সবাই ষোড়শ ডিভিশনের (sixteenth Division) ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা হয় প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের। ফলে ১৫ আগস্টের এই মর্মান্তিক ঘটনায় মুক্তিযোদ্ধারা ছিল নীরব, অসংগঠিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।[১২]

প্রতিবাদ

এত নীরবতার মাঝেও প্রতিবাদ যে কিছুই হয়নি তা বলা যাবে না, মুক্তিযুদ্ধে বাঘা সিদ্দিকী খ্যাত কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে একটি প্রতিরোধ হয়েছিল। কিশোরগঞ্জের একদল যুবক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রথমদিকে প্রতিবাদ ক্যাম্পাসে রাখলেও ৪ নভেম্বর তারা ধানমণ্ডির ৩২নং পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে যায়। অল্পকিছু শিক্ষার্থী শুরু করলেও হাজার হাজার সাধারণ মানুষ এই প্রথম জাতির জনকের হত্যার প্রতিবাদে রাস্তায় নামে। ১৬ আগস্ট ছাত্রলীগ কর্মী রায় রমেশের নেতৃত্বে খুলনার সরকারি ব্রজলাল কলেজে একটি প্রতিবাদ মিছিল হয়। বিচ্ছিন্নভাবে সারা দেশে কমবেশি প্রতিবাদ হয়।

রাজনীতিতে আদর্শিক পরিবর্তন

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রদে হতাশ মধ্যবিত্ত বাঙালি ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে নিজেদের বিকাশের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। কিন্তু ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের এক অধিবেশনে একটি মাত্র মুসলিম দেশ, পাকিস্তানের কথা বলা হলে বাঙালি আশাহত হয়। সঙ্গত কারণে অন্যান্য বাঙালির মতো বঙ্গবন্ধুও পাকিস্তান আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। ব্যক্তিগত জীবনে অসাম্প্রদায়িক শেখ মুজিব পাকিস্তান আন্দোলনে যুক্ত হলেও পাকিস্তান সৃষ্টির পর ব্রিটিশ মানসিকতার উত্তরসুরী পাকিস্তান সরকার এবং মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। গড়ে তোলেন অসাম্প্রদায়িক গণমুখী রাজনৈতিক দল *আওয়ামী মুসলিম লীগ*। সময়ের বাস্তবতায় দলের নামকরণে 'মুসলিম' শব্দটি যুক্ত হলেও আদর্শগত দিক থেকে ছিল অসাম্প্রদায়িক। কিন্তু দুর্ভাগ্য দলটির মধ্যে অতি ডান-অতি বামের আধিক্য দেখা যায়। কখনও এদের স্বরূপ বোঝা যেতো, কখন না। ১৯৫৫ সালে দলের কাউন্সিলে 'মুসলিম' শব্দটি উঠিয়ে দেয়ার প্রস্তাব উঠলে এই গ্রুপের প্রতিনিধি পঁচাত্তরের খলনায়ক খন্দকার মোশতাক এবং আব্দুস সালাম সভা ত্যাগ করে বেরিয়ে যান। প্রতিক্রিয়াশীল এই চক্র বাঙালি জাতির মুক্তির মহাসনদ বঙ্গবন্ধুর ৬-দফারও বিরুদ্ধাচরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন এই শ্রেণির প্রতিনিধি খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ করে

বাংলাদেশের জন্মকে ঠেকিয়ে দিতে চেয়েছিল। বাঙালির গণতন্ত্রের সংগ্রাম, স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কিংবা স্বাধীনতার সংগ্রাম-সবই ছিল পাকিস্তান এবং প্রতিক্রিশীল চক্রের কাছে অনৈসলামিক, ভারতের প্ররোচনা। কাজেই বঙ্গবন্ধুকে অন্যান্যের সাথে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিরুদ্ধেও লড়তে হয়েছে। একাত্তরে তারা ধর্মকে মুক্তিকামী জনগণের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে এহেন কোনো জঘন্য কর্ম নেই, যা করেনি। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা এভাবেই বাঙালির চেতনায় বিকাশ লাভ করেছে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে তার প্রতিফলন দেখতে চেয়েছে।

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু যেদিন বাংলাদেশে আসেন সেদিন রেসকোর্সের জনসভায় বলেন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। পরে তিনি এর সঙ্গে যোগ করেন জাতীয়তাবাদ। ১৯৭২ সালে এই চার নীতিকেই সংবিধানে রাষ্ট্রের মূলনীতির মর্যাদা দেওয়া হয়।[১৩] পূর্বেই বলা হয়েছে, পাকিস্তানি আমলে ধর্মকে রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত করার পরিণাম দেখে জাতির জনক সংবিধানের ১২নং অনুচ্ছেদে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি লোপ করেন। বলা হয় রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যদাদান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার এবং কোনো বিশেষ ধর্মালম্বীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ করা হবে। তা ছাড়া সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদে ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক সমিতি বা সংঘ গঠন নিষিদ্ধ করা হয়। এই বিধানের আওতায়ই মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামি ও নেজামে ইসলামের মতো দল যারা মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনির সহযোগী হিসেবে কাজ করেছিল, তাদের বেআইনি ঘোষণা করা হয়। রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক রেখে সকল ধর্মকে সমান মর্যাদা প্রদান করা হয়। এ সময় বেতার, টেলিভিশন ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে, পবিত্র কোরান, গীতা, বাইবেল ও ত্রিপিটক পাঠ হতে লাগলো। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক ঘটনার পরে খন্দকার মোশতাক দেশটাকে উল্টোদিকে প্রবাহিত করতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। রাষ্ট্রপতির প্রথম ভাষণেই তিনি বাঙালির মুক্তির শ্লোগান 'জয়বাংলা'র পরিবর্তে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' বলে ভাষণ শেষ করেন। এরপর 'বাংলাদেশ বেতার' হয়ে গেল 'রেডিও বাংলাদেশ'। গলাবন্ধ লম্বা কোট এবং মাথায় টুপি হলো নতুন পোশাক। এটি ছিল পাকিস্তানের জাতীয় পোশাক, মোশতাক শুধু জিন্নাহ টুপিটা বদলিয়ে দেন। ১৯৭৭ সালে ২৩ এপ্রিল এক ঘোষণাপত্রের আদেশবলে তৎকালীন শাসক সংবিধান সংশোধন করে সংবিধানের প্রস্তাবনার শীর্ষদেশে 'বিসমিল্লাহি রাহমানির রাহিম' সংযোজন, 'জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের' বদলে 'জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধ' ধর্মনিরপেক্ষতার জায়গায় 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যায় 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার' সংযোজন করে ১২নং অনুচ্ছেদ করেন। জাতীয়তাবাদী চেতনা যা আমাদের সমস্ত আন্দোলন সংগ্রামের ভিত্তি সেটি পরিবর্তিত হয়ে 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের' ঘোষণা দিয়ে এক ধরনের ধোঁয়াশা সৃষ্টি করা হলো। উদ্দেশ্য, বাঙালির স্বাধিকারের এ উপাদানটি সম্পর্কে একটি ভ্রম তৈরি করে গুরুত্বহীন করা। এ গুলোকে ৫ম সংশোধনীতে বৈধতা দেয়া হয়। এরপর ১৫ আগস্ট পরবর্তী সরকারগুলোর কর্মকাণ্ডকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মানসিকতা নিয়ে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যেমে 'ইসলামকে' রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দিয়ে এই ঘরানার শাসক এবং প্রতিনিধিদের মনের ষোলকলা পূর্ণ করেন জেনারেল এরশাদ। '৯০-তে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন হলেও পঁচাত্তর পরবর্তী

সরকারগুলোর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী কর্মকাণ্ড, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর রাজনীতিকরণ এবং সামাজিকীকরণ, '৭২ এর সংবিধানের কাটাছেঁড়ার কারণে রাষ্ট্র এবং সমাজের গায়ে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় তা আজও সারিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

১৫ আগস্টের ট্রাজেডির খুব ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর মুখোশ উন্মোচিত হয়েছিল, বাকিরা থেকে যায় পর্দার আড়ালে। ক্ষমতায় গিয়ে মোশতাক তাদেরকে পুরস্কৃত করতে থাকেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, মোশতাক তার প্রথম ভাষণে ১৫ আগস্টের হোতাদের 'জাতীয় বীর' 'দেশের সূর্য সন্তান' বলে অভিহিত করেন। মোশতাক শফিউল আযমকে সেক্রেটারি জেনারেল, মাহবুবুল আলম চাষীকে রাষ্ট্রপতির প্রধান সচিব এবং তবারক হোসেনকে পররাষ্ট্র সচিব, সত্তরের পূর্বাঞ্চলের গোয়েন্দা প্রধান বি এম সফদারকে গোয়েন্দা প্রধান নিয়োগ করেন। এরা প্রত্যেকেই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তান সরকারের পক্ষে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিলেন। এছাড়া মুজিব হত্যাকারীদের ১২ জনকে ১৯৭৬ সালের ৮ জুন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকুরি দিয়ে পুরস্কৃত করেন।

পাকিস্তানিরা নিঃসন্দেহে খুশি হয়েছিলো। মাত্র ৮ ঘণ্টার ব্যবধানে নতুন সরকারকে স্বীকৃতি, বন্ধুত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ চাল, সুতিকাপড় উপহারের ঘোষণা, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে বাংলাদেশের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিতে এবং কূটনৈতিক মিশনগুলোকে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করার অনুরোধে বোঝা যায় পাকিস্তানের সহানুভূতি।

বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে সুযোগ

১৫ আগস্টের পর নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনীতি ১৯৭৬ সালের ৪ আগস্ট শর্তসাপেক্ষে চালু হয়। আওয়ামী লীগ যেদিন শর্তপূরণ করে রাজনীতি করার সুযোগ পেলো সেদিন (৫ নভেম্বর ১৯৭৬) দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হয়-এ পর্যন্ত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ১৭ এবং আরো ৫৬টি প্রক্রিয়াধীন। বস্তুত এ সময়ে খুচরো রাজনৈতিক দল গঠনের হিড়িক পড়ে যায়। শত শত নামসর্বস্ব ও প্যাডসর্বস্ব দল গড়ে ওঠে।[১৪] রাজনীতির নামে হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদ বাতিল করে '৭২ এ নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলোর আবার রাজনীতির মাঠে ফিরে আসার সুযোগ দেয়া হয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য 'বাংলাদেশ দালাল আইন (বিশেষ ট্রাইবুনাল) অধ্যাদেশ ১৯৭২' জারি হয়। '৭৩ এর নভেম্বর পর্যন্ত ৩৭৪৭১ জনকে গ্রেফতার এবং এদের মধ্য থেকে ৭৫২ জন দণ্ডিত হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর এ দালাল আইন বাতিল করা হয়। শুধু তাই নয়, মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতা এবং জঘন্য অপরাধে অভিযুক্ত ও নাগরিকত্ব বাতিলকৃত ৯ জনের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিয়ে দালালদের পুনর্বাসনের সুযোগ দেয়া হয়। প্রকৃত বিচারে, বহুদলীয় গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে সামরিকতন্ত্র, এবং সামরিকতন্ত্র সর্বদাই প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিকে পুষ্টি জোগান দেয়। ফলে এখানে যা দাঁড়ায়, বহুদলীয় গণতন্ত্রের নাম দিয়ে আসলে প্রতিক্রিয়াশীল, আরো স্পষ্ট করে বললে, যারা সরাসরি একাত্তরের গণহত্যায় জড়িত ছিল, তাদেরকে রাজনীতির মাঠে আবারও সক্রিয় করার সুযোগ ও পরিস্থিতি তৈরি করে দেয়া হয়।

বহিঃবিশ্বের সাথে সম্পর্ক

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থা, রাষ্ট্রিয় আদর্শের সাথে সামঞ্জস্য এবং মহান মুক্তিসংগ্রামে ভারতের অকৃত্রিম সাহায্যের কথা মাথায় রেখে অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার সাথে ভারতের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু আগ্রহী ছিলেন। তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় সৈন্য ফেরত, ভারতের সাথে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন, ফারাক্কা বাঁধ থেকে গঙ্গার পানি প্রবাহের উল্লেখযোগ্য অংশ আদায় করেন। এরপর ভারতের পছন্দের বাইরে গিয়ে একজন জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে দেশের স্বার্থে তিনি ইসলামী সম্মেলন সংস্থায় যোগদান করেন উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায়। পাকিস্তানের সাথে দেনা-পাওনা মেটানো, আটকে পড়া পকিস্তানিদের ফেরত নেয়া এবং দেশের ডানপন্থীদের 'পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার আন্দোলন' প্রতিহতের জন্য পাকিস্তানের স্বীকৃতিটা খুব দরকার ছিলো। বাংলাদেশকে ইসলামিক রাষ্ট্র ঘোষণার মুসলিম বিশ্বের চাপ অত্যন্ত যুক্তিসহকারে খণ্ডন করে তিনি তার উদ্দেশ্য সফল করেন। ১৯৭৪ সালে ফেব্রুয়ারিতে তিনি পাকিস্তানের স্বীকৃতি এবং ১৯৭৩ সালের মধ্যে সৌদিআরব এবং সুদান বাদে প্রায় সব মুসলিম বিশ্বের স্বীকৃত আদায় করেন। ১৯৭১ সালে ২টি '৭২-এ ৯৮টিসহ বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে ১২৭টি দেশের স্বীকৃতি, জাতিসংঘসহ ১৬টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ শক্তিশালী পররাষ্ট্রনীতির বহিঃপ্রকাশ। শক্তিশালী পররাষ্ট্রনীতি '৭৫ পরবর্তীতে নতজানু পররাষ্ট্রনীতিতে রূপ নেয়।

পরিশেষে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার পুনরুত্থান ও গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে সামরিকতন্ত্রের পুনঃআবির্ভাব-এই দুটি ফেনোমেননের কথা বারবার উচ্চারিত হয়েছে। আমরাও বিভিন্ন আলাপে বলেছি, বলছি। এই পরিবর্তন যেমন হয়েছে রাষ্ট্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, সংবিধান পরিবর্তনে, তেমনি পরিবর্তন হয়েছে মতাদর্শেও। পরিবর্তনের দুটি চেহারা একত্রে ঘটলেও একেক সময় একেকটা প্রকট হয়েছে। পরিবর্তিত রাষ্ট্রের কাঠামোর অন্তর্নিহিত মতাদর্শিক অবস্থানও উপরে আলোচনা করা হয়েছে। এক কথায়, একাত্তরে যে অভিমুখ নিয়ে বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করেছিল পঁচাত্তরে সেই অভিমুখ একেবারে উল্টে যায়। পঁচাত্তরের রক্তাক্ত ইতিহাস ও তার পরিণতিতে উপযুক্ত দু'ধরনের পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে আরও একটা বড়ো ধরনের পরিবর্তন ঘটে যায়। খুব সংক্ষেপে এটা বলা যায়, যদিও এই দিকটা উন্মোচন করা এখনো বাকি। বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষার উপস্থিতি প্রবল। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন হোক, আর পাকিস্তানি জামানায় হোক-দাবি দাওয়ার মধ্যে সবচেয়ে প্রবল উপস্থিতি ছিল গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। রাজনীতিতে সহনশীলতা, প্রবল শত্রুকেও সহ্য করা, বিরোধকে বিদ্বেষে রূপান্তর না করা, বিরোধাত্মক মতসমূহের সুস্থ মোকাবেলার পরিস্থিতি তৈরি করা, বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা-এগুলোকে একটা রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এগুলোর সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক ওতপ্রোত। এগুলো যেমন গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করে, তেমনি গণতন্ত্র এগুলোর বিরাজমানতাকে নিশ্চিত করে। পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের রাজনীতিতে এমন এক দ্বি-মেরুকরণ তৈরি করেছিল, যা পূর্বের সহনশীলতার যাবতীয় নজির স্রেফ উধাও হয়ে গিয়েছে। মহিউদ্দীন আহমেদের 'বেলা-অবেলা' গ্রন্থ পড়লেই বঙ্গবন্ধু ও

তৎকালের রাজনীতিবিদদের মধ্যকার বিরোধাত্মক অথচ সহনশীল সম্পর্কের অজস্র নজির পাওয়া যায়। পঁচাত্তরের পর রাজনীতির সেই মূল্যবান উপাদানটি রাজনীতি থেকে হারিয়ে যায়। এমনকি, বিচার-ব্যবস্থাও একইরূপ কাজ করেছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর দায়মুক্তি দেয়ার নজির বিবেচনা করে দেখুন। এরপর থেকে বিচার হয়েছে কিন্তু রেজিম-নিরপেক্ষ থাকেনি। যার যে আমল তার বিচার কেবল তার আমলেই হয়ে থাকে। পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর রাজনীতিতে যে রক্তাক্ত ও ষড়যন্ত্রের ইতিহাস তৈরি হয়েছে, তার রেশ এখনো কাটেনি। এমনতর রক্তাক্ত সহিংস ঘটনা রাজনীতির জগতে দীর্ঘ আচড় রেখে যায়। বাংলাদেশের রাজনীতির যে প্রবল মেরুকরণ ঘটেছে সেটা একেবারেই পঁচাত্তর পরবর্তী ফেনোমেনন। বিরোধিতা এখন সহজেই বিদ্বেষে পৌঁছে যায়। মতাদর্শিক এমন অবস্থার কারণে মাঠের রাজনীতি হয়ে উঠে প্রবল প্রতিশোধপরায়ণ। পঁচাত্তর পরবর্তী ফেনোমেনন হিসেবে এ দিকটার স্বরূপ উন্মোচন জরুরি বিষয়।

তথ্যসূত্র

১. নুরুল ইসলাম নাহিদ ও পিয়াস মজিদ, *জয় বাংলা*, চারুলিপি প্রকাশনী, ঢাকা ২০২০, পৃ. ৫৭

২. ড. মোহাম্মদ হাননান, *বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৯, পৃ. ১২

৩. এম আর আখতার মুকুল, *কে ভারতের দালাল*, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা ১৯৯৫, পৃ. ৩০

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৫. পরেশ সাহা, *মুজিব হত্যার তদন্ত*, জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ঢাকা ১৯৯৬, পৃ. ৮

৬. এ এল খতিব, *হু কিলড মুজিব*, কোয়ালিটি পাবলিশার্স, ঢাকা ২০১৪ পৃ. ১০

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৮. ড. মো মাহবুবর রহমান, *বঙ্গবন্ধুর শাসনামল (১৯৭২-১৯৭৫)*, সুবর্ণ, ঢাকা ২০২২, পৃ. ২৯, ৩১২

৯. ড. মোহাম্মদ হাননান, *বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৯, পৃ.

১০. পরেশ সাহা, *মুজিব হত্যার তদন্ত*, জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ঢাকা ১৯৯৬, পৃ. ১৩,

১১. এ এল খতিব, *হু কিলড মুজিব*, কোয়ালিটি পাবলিশার্স, ঢাকা ২০১৪, পৃ. ৩৩

১২. শাহরিয়ার কবির, *শেখ মুজিব ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা*, সময় প্রকাশন, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ. ২৪

১৩. আনিসুজ্জামান, *ইহজাগতিকতা ও অন্যান্য*, কারিগর প্রকাশনী, কলকাতা ২০১২, পৃ. ১৯৯

১৪. ড. মোহাম্মদ হাননান, *বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩৫